দ্বিতীয় অধ্যায়

বঙ্কিমচন্দ্র ও বঙ্কিম-যুগের মুখ্য পুরুষ চরিত্র

'শিল্প সাহিত্যের ক্ষেত্রে যখন এই বিষয়-চেতনা, স্থান-কাল চেতনা বিকাশলাভ করিতেছিল, যখন আত্মপ্রকাশের চাঞ্চল্য সমাজের সর্বাঙ্গে অনুভূত হইতেছিল এবং যে মুহূর্তে সামাজিক ভারসাম্য রীতিমত ক্ষুণ্ণ হইতে চলিয়াছে, সেই যুগসন্ধিক্ষণে বঙ্কিমচন্দ্রের কর্ম ও সাহিত্যজীবনের সূত্রপাত।'[১]

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের মূল উপজীব্য ছিল পারস্পরিক নানাপ্রকার জটিলতায় সমৃদ্ধ সেই সমস্ত নরনারী যারা ভারতে ইংরেজ শাসনকালে জন্মলাভ করেছিল। বঙ্কিমের উপন্যাসের মধ্যে একদিকে যেমন নানাশ্রেণীর সমন্বয় পরিলক্ষিত হয়, অপরদিকে তেমনই তৎকালীন সমাজের এক জীবন্ত প্রতিচ্ছবিও প্রতিভাত হয়। বঙ্কিমের সাহিত্যজগতে আবির্ভাব এমন এক সময়ে যখন সারাদেশ আলোড়িত হচ্ছে একদিকে সিপাহী বিদ্রোহ ও অপরদিকে স্বদেশী আন্দোলনের স্রোতধারায়।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এমন এক সময়ের লেখক যখন সামন্তবাদের সঙ্গে ধনবাদের সংঘর্ষ দেশের আর্থ-সামাজিক কাঠামোর ওপর এক সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করেছে। ধনবাদী সমাজের মূল বৈশিষ্ট্যটি হলো—'সমাজ কাঠামোর প্রতিঘাতে ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা।···ধনবাদী সাহিত্য তাই প্রধানত ব্যক্তিমানসের বিস্তারের চিত্রণ ও বিশ্লেষণ।'[২]

বঙ্কিমচন্দ্র যখন উপন্যাস রচনা শুরু করেন, ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাজপ্রেক্ষিত তখন ক্রমোন্নতির দিকে ধাবমান। সমাজসংস্কারক রামমোহন, বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় অষ্টাদশ শতাব্দী ও তার পূর্ববর্তী অন্ধ কুসংস্কারগুলির মূলোৎপাটন প্রচেষ্টা চলেছে। সতীদাহ প্রথা, গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জন, নরমেধ প্রভৃতি ধর্মীয় কুসংস্কার প্রায় অবলুপ্তির পথে। ইংরেজ শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত। অনতিঅতীতে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পটভূমিকায় সিপাহী বিদ্রোহ ঘটলেও তা ব্যর্থ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সারা ভারতবর্ষে বিদেশি ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী শক্তি শক্ত শিকড় তৈরি করে নিয়েছে। অপরদিকে পূর্বতন অবক্ষয়িত মুসলিম শাসনের কুফল ও ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির দ্বৈতশাসনের অত্যাচারের হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়া যাবে এই প্রত্যাশায় অনেকেই সাম্রাজ্যবাদী বিদেশি ইংরেজ রাজনীতির প্রত্যক্ষ শাসনকে আপাত ভালো বলেই গ্রহণ করছেন। বিশেষ করে বাংলাদেশে সিপাহী বিদ্রোহের প্রভাব খুব বেশি না পড়ায় এখানকার রাজনৈতিক অর্থনৈতিক অবস্থার একটা স্থিতাবস্থা বজায় ছিল যার ফলে নবজাগরণের উন্মেষের সুফলগুলির প্রত্যক্ষ ফলাফল লাভ করা গিয়েছিল। বিশেষ করে বাংলাসাহিত্যে নবজাগৃতির প্রভাবে এক ব্যাপক সমৃদ্ধি ঘটে যার অন্যতম শ্রেষ্ঠ দিশারী ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রই। এই সময় বাংলা কাব্যধারায় এসেছেন মধু-হেম-নবীন, নাট্যধারায় দীনবন্ধু, মধুসূদন, গিরিশ, প্রবন্ধ বা সমালোচনা ধারায় বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার, ভূদেব প্রভৃতির মতো সৎ-ব্যক্তিত্বেরা। সাহিত্যে ও সমাজে নারীমুক্তি আন্দোলন স্বীকৃত হয়েছে। নারীদের শিক্ষার অধিকার, সম্পত্তিতে অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ধর্মীয় কুসংস্কারের সীমায়িত গণ্ডী ভাঙার প্রয়াস রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের 'যত মত তত পথ' মতাদর্শের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে। এমতাবস্থায় বঙ্কিম এলেন, সৃষ্টি করলেন এবং জয় করলেন। বঙ্কিমচন্দ্র যে বাংলাসাহিত্যের অন্যতম সর্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই কারণ

তিনিই সর্বপ্রথম নানাধরনের বাংলা উপন্যাসের কায়া নির্মাণ করেন। পাশ্চাত্য উপন্যাস ও রোমান্সের প্রভাবে কথাসাহিত্য লেখা শুরু করলেও, কিছুদিনের মধ্যেই তিনি তাঁর স্বকীয়তার পথ খুঁজে নিলেন। সামাজিক উপন্যাস রচনায় চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব বিশ্লেষণের সাহায্যে তিনি বাংলা উপন্যাস ধারাকে শুধুমাত্র সমৃদ্ধ করলেন না, তাকে আধুনিকতার দিকে অগ্রসরও করে দিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র শুধুমাত্র কথাসাহিত্যিক ছিলেন না, ছিলেন মননশীল প্রাবন্ধিকও। বাঙালির জীবনকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আদর্শের মিলনভূমিতে স্থাপন করে মননশীল সাহিত্য, কথাসাহিত্য, দেশ ও দশের কথা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে তিনি বাঙালিকে সংস্কারমুক্ত, মানবতাবাদী, জীবনরস ও প্রাণবাণীতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। বাঙালির মনকে তিনি মননের দ্বারা সুদৃঢ় করে, সংস্কারকে যুক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ক'রে, প্রাচীন ইতিহাসকে পুনরুদ্ধার করে, এবং স্বাদেশিক মন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে নতুন মানবতাবাদের পন্থা নির্দেশ করেছিলেন। কথাসাহিত্যেও তাঁর এই মানসিক সচেতনতার প্রকাশ লক্ষণীয়। 'যদি মনে এমন বুঝিতে পারেন যে, লিখিয়া দেশের বা মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গলসাধন করিতে পারেন অথবা সৌন্দর্য সৃষ্টি করিতে পারেন তবে অবশ্য লিখিবেন।···যাহা অনিত্য, ধর্মবিরুদ্ধ, পরনিন্দা বা পরপীড়ণ বা স্বার্থ যাহার উদ্দেশ্য, সে সকল প্রবন্ধ কখনও হিতকর হইতে পারে না। সুতরাং তাহা একেবারে পরিহার্য, সত্য ও ধর্ম্মই সাহিত্যের উদ্দেশ্য। অন্য উদ্দেশ্যে লেখনীধারণ মহাপাপ।'[৩]

সামাজিক প্রেক্ষিত ও বঙ্কিম মানসিক প্রেক্ষিত—এই দুইকেই সামনে রেখে বঙ্কিম উপন্যাসের মুখ্য পুরুষ চরিত্র বিচার্য।

বঙ্কিমচন্দ্রের মোট চৌদ্দটি উপন্যাসের মধ্যে বেশ কয়েকটি অতীত ইতিহাসের রহস্যমায়ায় বিজড়িত রোমান্স কাহিনী। সুতরাং সেইসকল উপন্যাসের নায়করা তথা মুখ্য পুরুষ চরিত্রগুলি সমকালের সামাজিক প্রেক্ষাপটের স্বার্থে বিচার্য নয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস ১৮৬৫ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত 'দুর্গেশনন্দিনী'। 'আলালের ঘরের দুলাল'এর অসম্পূর্ণতা দূর করে বঙ্কিমচন্দ্র 'দুর্গেশনন্দিনী'র মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্যজগতে এক নব্যধারা সৃষ্টি করলেন। 'দুর্গেশনন্দিনী' রচনার আগে ইতিহাসের অঙ্গনে পাঠকসমাজের কাছে অপরিচিত ছিল। তাই 'দুর্গেশনন্দিনী' শুধুমাত্র একটি নিটোল গল্প উপহার দিল তাই নয়, উপন্যাসের সীমাকে প্রসারিত করল। কালের বিচারে 'দুর্গেশনন্দিনী'র গুরুত্ব অপরিসীম হলেও এই উপন্যাসের মধ্যে অপরিণতির চিহ্ন অনেক। সংজ্ঞাগত দিক দিয়ে উপন্যাসের মূল চরিত্রগুলি অবশ্যই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল হবে। কিন্তু 'দুর্গেশনন্দিনী'র মধ্যে আমরা যে পুরুষ চরিত্রগুলি পাই যেমন মানসিংহ, বাতলু খাঁ, জগৎসিংহ, ওসমান এদের মধ্যে উপন্যাসোচিত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের চিহ্ন সুস্পষ্ট নয়। আসলে এর মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র চরিত্র বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলার থেকেও বেশি জোর দিয়েছেন যুগবৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলার ওপর। মাত্র কয়েকটি পরিচ্ছেদের মধ্য দিয়ে সামগ্রিক ঘটনাকে সমাপ্ত করার ফলে চরিত্রগুলির সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ সম্ভব হয়নি। পারিবারিক বা সামাজিক উপন্যাসে আমরা বিভিন্ন ভাব-প্রকাশের যে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ দেখে থাকি, তা এখানে লভ্য নয়, উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় বন্দীশিবিরে আয়েষা যখন বলে, 'ওসমান যদি তুমি জিজ্ঞাসা কর, তবে আমার উত্তর এই যে, এই বন্দী আমার প্রাণেশ্বর।'[৪] তখন তা হঠাৎ আরোপিত বলে মনে হয়। আয়েষার প্রেমের এই স্বীকারোক্তি অন্যভাবেও উপস্থাপন করা যেতে পারতো। কিন্তু মূলত রোমান্সসুলভ বৈশিষ্ট্যের দ্বারা উপন্যাসটি ভারাক্রান্ত হওয়ার দরুণ সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ অবহেলিত হয়েছে। মানসিক দ্বন্দ্বের দিক থেকে বিচার করলেও অনেক ত্রুটি চোখে পড়ে।

জগৎসিংহের চরিত্রের মধ্যে যে মানসিক দোদুল্যমানতা ত উপন্যাসের নায়ক চরিত্রের দ্বান্দ্বিক দোদুল্যমানতা নয়, তা হলো দুর্বল চরিত্রের দোদুল্যমানতা। কিন্তু এসব সত্ত্বেও অনেকগুলি চরিত্র খুবই জীবন্ত। বিশেষত লেখনীর গুণে চরিত্রগুলির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের পার্থক্যগুলি আমাদের কাছে সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে।

বঙ্কিমের দ্বিতীয় উপন্যাস 'কপালকুণ্ডলা' (১৮৬৬)। 'এই উপন্যাসে তাঁহার প্রতিভা যেন শৈশব অতিক্রম করিয়া এক ধাপে পরিপূর্ণ যৌবনে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।' 'দুর্গেশনন্দিনী'র আখ্যান পটভূমি ঐতিহাসিক তার মুখ্য চরিত্রগুলিও ঐতিহাসিক। কিন্তু 'কপালকুণ্ডলা'র পশ্চাৎপটে ইতিহাস থাকলেও এই উপন্যাসের অধিকাংশ চরিত্র বিশেষত নায়ক তথা মুখ্য পুরুষ চরিত্র নবকুমার কোনো ঐতিহাসিক চরিত্র নয়। নবকুমারের বংশানুক্রমিক জীবিকা সম্পর্কে নির্দিষ্ট করে উল্লেখ না থাকলেও বুঝতে অসুবিধা হয় না যে নবকুমার ধনীর সন্তান। লেখকও বলেছেন, 'নবকুমার দরিদ্রের সন্তান ছিলেন না।'[৫] নবকুমারের চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করলে বলতে হয় নবকুমার একটি রোমান্টিক ট্রাজিক চরিত্র। কিন্তু দুর্গেশনন্দিনীতে যে রোমান্স ঐতিহাসিক যুগ বিগ্রহের ছত্রছায়ায় আচ্ছাদিত ছিল 'কপালকুণ্ডলা'র সেই রোমান্স আবরণ উন্মোচন করে আমাদের কাছে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। 'কপালকুণ্ডলা'কে রোমান্সধর্মী উপন্যাস বলেই উল্লেখ করতে হয়, যাতে সার্থক সামাজিক উপন্যাসের অনুকূল বৈশিষ্ট্য অপ্রতুল। এইখানেই ইউরোপীয় সাহিত্যের সঙ্গে পার্থক্য বাংলা রোমান্সের।

'ইউরোপীয় সাহিত্যে সাধারণত ঐতিহাসিক দ্বন্দ্ব সংঘাতের বা বিচিত্র বিরোধ জটিল প্রেমের অপ্রত্যাশিত বিকাশের মধ্য দিয়ে রোমান্সের অনুসন্ধান হয়, ইউরোপীয় সভ্যতার এই স্বাভাবিক বিকাশের পথেই রোমান্স জীবনে প্রবেশ লাভ করে। কিন্তু ইতিহাস বা প্রেমের মধ্যে যে রোমান্সকে পাওয়া যায়, তা আমাদের উপন্যাসে ঠিক স্বাভাবিক হয় না, বাস্তব জীবনের ঠিক অনুবর্তন করে না।' যদিও 'কপালকুণ্ডলা'র নায়ক নবকুমার 'দুর্গেশনন্দিনী'র নায়ক জগৎসিংহ অপেক্ষা আমাদের অনেক বেশি কাছের মানুষ, তা সত্ত্বেও বাস্তব জীবনের অসামঞ্জস্য করেছে কল্পলোকের আতিশয্য। তাই বলা যায় 'কপালকুণ্ডলা' কাব্য, উপন্যাস নহে।'

'এই উপন্যাসে দু-একটি আকস্মিক ঘটনার অবতারণা করা হইয়াছে এবং তাহারা মূল কাহিনীতে অতি সুন্দরভাবে মিশিয়া গিয়াছে। বড়ো আখ্যায়িকায় কখনো কখনো আকস্মিক ঘটনার প্রতিক্রিয়া দেখাইতে হয়। মনুষ্যজীবন যে জ্যামিতিক রেখার মতো সরল নয়, তাহার মধ্যে যে বহু দুর্জেয় শক্তির ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া রহিয়াছে তাহা এই সকল আকস্মিক ঘটনার অভ্যাগমে সূচিত হইয়া থাকে।'[৬]

কিন্তু কাহিনী নির্মাণ, চরিত্রসৃষ্টি ইত্যাদির আঙ্গিকে বিচার করলে 'কপালকুণ্ডলা' অনেক উচ্চস্তরের উপন্যাস হওয়া সত্ত্বেও তা ঐতিহাসিক ও রোমান্টিক উপন্যাসের গণ্ডীতেই সীমাবদ্ধ রয়ে গেছে। 'আসলে চরিত্রকে আরও রক্তমাংসের করে তুলতে হলে, কাহিনীতে স্বাভাবিকতার প্রতীক আনতে হলে লেখাকে নির্মমভাবে পক্ষপাতশূন্য ভাবে মনোবিশ্লেষণের আশ্রয় নিতেই হবে।'[৭]

'কপালকুণ্ডলা'র পরের রচনা 'মৃণালিনী' (১৮৬৯)। 'দুর্গেশনন্দিনী'র পর যে পরিবর্তনের বাঁক কিছুটা লক্ষ করা যায় 'কপালকুণ্ডলা'র মধ্যে, 'মৃণালিনী'তে তা আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে এসেছে। ইতিহাস ও রোমান্সের যুগলবন্দীর স্বাক্ষর 'মৃণালিনী'। তবে বাস্তবতার বিচারে 'মৃণালিনী'র চরিত্রগুলি অনেক বেশি বাস্তব পূর্ববর্তী দুটি উপন্যাসের তুলনায়। জগৎসিংহ অথবা ওসমানের তুলনায় নবকুমার অনেক বেশি বাস্তব। আবার নবকুমারের তুলনায় হেমচন্দ্র আরও বেশি বাস্তব। ব্যক্তিত্বের নিরিখে বিচার করলে হেমচন্দ্র, জগৎসিংহ অথবা নবকুমার অপেক্ষা অনেক বেশি

উজ্জ্বল। হেমচন্দ্র, জগৎসিংহের মতো বীরোচিত আদর্শের ছায়া অথবা নবকুমারের মতো দুর্ভাগ্যের নীরব দর্শক মাত্র নয়। তার ক্রোধ, অভিমান, চিত্তচাঞ্চল্য, হঠকারিতা প্রভৃতি তাকে চেনা জগতের অনেক কাছাকাছি এনে দাঁড় করিয়েছে। তিলোত্তমা ও মৃণালিনী উভয়েই শান্ত, নম্র, দয়িতের প্রতি আত্মসমর্পণমুখী, কিন্তু মৃণালিনী, তিলোত্তমা অপেক্ষা ব্যক্তিত্বময়ী। কিন্তু 'মৃণালিনী' উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাস ও প্রেমকাহিনীর মধ্যে যথার্থ যোগসূত্র সাধনে ব্যর্থ হয়েছেন। উপন্যাসটিতে তথ্যের অভাব আছে। বঙ্কিম এই অভাব পূরণ করতে চেয়েছেন কল্পনার দ্বারা। হেমচন্দ্র, মাধবাচার্য,পশুপতি, লক্ষ্মণসেন, শান্তশীল প্রভৃতি চরিত্র ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে কতটা বিশ্বাসযোগ্য তা বিতর্কিত। বাস্তবতার দিক থেকে আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে একজন বিত্তহীন ব্রাহ্মণ ও রাজ্যচ্যুত রাজপুত্রের পক্ষে অর্থবল ও লোকবল ছাড়া কিভাবে মুসলমান সাম্রাজ্য ধ্বংস করা সম্ভব? 'মৃণালিনী' উপন্যাসের এই অবাস্তবতার কারণ বিশ্লেষণ করতে গেলে আমাদের ফিরে যেতে হবে ইতিহাসের গতিপথে—সেখানে আমরা দেখি আমাদের দেশে কয়েকজন ব্যক্তির আবেগকে কেন্দ্র করেই ইতিহাসের ধারা আবর্তিত হয়েছে।

হেমচন্দ্র ও পশুপতি এই কারণেই যথার্থ বাস্তব চরিত্র হয়ে উঠতে পারেনি।

১৮৭৪ সালে রচিত হলো 'যুগলাঙ্গুরীয়'। এই উপন্যাসটিও শুরু হয়েছে ভাগ্যের ওপর নির্ভর করেই। আনন্দস্বামীর জ্যোতির্গণনা সমস্ত উপন্যাসটিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। এই অর্থে উপন্যাসটি দুর্গেশনন্দিনী অথবা 'মৃণালিনী'র সঙ্গে তুলনীয় হলেও পূর্বের উপন্যাসগুলির মতো এখানে ভাগ্যের লিখন অব্যর্থ হয়ে দেখা দেয়নি। পুরন্দর-হিরন্ময়ী বাল্যকাল থেকে পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত। হিরন্ময়ী পিতার ইচ্ছানুযায়ী বিবাহে সম্মত হয়েছে। বিবাহের রাত্রে আনন্দস্বামীর দেওয়া অঙ্গুরীয় পরবর্তীকালে রাজা মদনদেবের কাছে দেখতে পায়। মদনদেবের কাছে হিরন্ময়ী জানতে পারে এই অঙ্গুরীয় আনন্দস্বামী তাঁর হাতে পরিয়ে দিয়েছেন। হিরন্ময়ী পুরন্দরের প্রতি অনুরক্ত। সে মনের দিক থেকে দ্বিচারিণী হতে চায়নি বলেই সাময়িকভাবে নীরব থাকলেও সে পুরন্দরের প্রতি তার আসক্তির কথা স্বীকার করে। এরজন্য মূল্য হিসাবে মদনদেবের কাছে রত্নহার বিক্রয়ের মিথ্যা কলঙ্ক গ্রহণ করতেও সে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেনি। হিরন্ময়ীর চরিত্রের ব্যক্তিত্ব তাকে রাজমহিষী হবার প্রলোভন জয় করতে সাহায্য করেছে।

এই উপন্যাসে পুরন্দরের ভূমিকা বিশেষ নেই বললেই চলে। সেই অর্থে মুখ্য পুরুষ চরিত্র হিসাবে বরং মদনদেবের উল্লেখ করা যেতে পারে। কিন্তু হিরন্ময়ীর তুলনায় অন্যান্য চরিত্রগুলি অত্যন্ত নিষ্প্রভ ও ম্লান। কিন্তু উপন্যাসে অন্যতম একটি অসংগতি হলো এই যে হিরন্ময়ী প্রেমের মর্যাদা রক্ষায় 'কুলটা'র কলঙ্ক মাথা পেতে নিতেও আগ্রহী। সেই হিরন্ময়ীর পক্ষে কি বিনা প্রতিবাদে অন্য পুরুষকে বিবাহ করা সম্ভব? একই কথা পুরন্দরের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। হিরন্ময়ীর প্রতি তার একনিষ্ঠ প্রেম তাকে সুদূর সিংহলে প্রেরণ করেছে, অথচ বিনা প্রতিবাদে পিতার আজ্ঞানুসারী অন্য নারীর কাছে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে, এই ঘটনা পুরন্দরের চরিত্রের ব্যক্তিত্ব ও দৃঢ়তার পরিচায়ক নয়। যে পুরুষ ব্যক্তিত্ববর্জিত ছায়ামাত্র, সেই পুরুষ কখনও কোনো সার্থক উপন্যাসের মুখ্য পুরুষ চরিত্র হতে পারে না।

১৮৭৫ সালে লিখিত 'চন্দ্রশেখর' বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলির মধ্যে অন্যতম। এই উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসের গণ্ডি অতিক্রম করে পারিবারিক জীবনে প্রবেশ করেছে। আমাদের বক্তব্য বিষয় আলোচনা প্রসঙ্গে একথা বার বার বলার চেষ্টা করা হয়েছে যে সমসাময়িক যুগকে বাদ দিয়ে কোনো মহৎ সাহিত্য রচনা প্রায়

UNIVERSITY ★ CALCUTTA CENTRAL LIBRARY

CALCUTTA ★ CENTRAL LIBRARY ★

অসম্ভব। সে সময় বাংলাদেশে মুসলমান রাজত্ব ধ্বংসের মুখে এবং ইংরাজ বণিকরা অর্থ উপার্জনের লালসায় সাম্রাজ্য স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে প্রজা শোষণ করে চলেছে। এই ঐতিহাসিক পটভূমিকায় 'চন্দ্রশেখরে'র আবির্ভাব। এই উপন্যাসে বঙ্কিম যে কলাকৌশল দেখিয়েছেন তা অনবদ্য বলা চলে। উপন্যাসটি দুটি আখ্যায়িকায় বিভক্ত— (১) প্রতাপ-শৈবলিনী-চন্দ্রশেখর কাহিনী, (২) মীরকাশেম-দলনী কাহিনী। চন্দ্রশেখরের রোমান্স মূলত মনস্তত্ত্বমূলক। উপন্যাসটির প্রধান চরিত্রগুলি অন্তর্দ্বন্দ্বে লিপ্ত। বিবাহিত নারীর প্রেম প্রদর্শন যা শৈবলিনী চরিত্র অঙ্কনের মধ্য দিয়ে বঙ্কিম দেখিয়েছেন, যে সাহসিকতার পরিচয় তিনি দিয়েছেন তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবি রাখে। কিন্তু উপন্যাসের শেষ পর্বে আমরা দেখি সাহিত্যিক বঙ্কিম নৈতিকতাকেই মর্যাদার আসনে বসিয়েছেন। চন্দ্রশেখর, প্রতাপ, মীরকাশিম প্রভৃতি চরিত্রগুলি যথেষ্ট জীবন্ত, একথা নিশ্চিতভাবেই বলা চলে। কিন্তু এ সত্ত্বেও উপন্যাসটি রোমান্সধর্মী রচনা। তাই সার্থক সামাজিক উপন্যাসের পর্যায়ে একে ফেলা চলে না।

বঙ্কিমচন্দ্রের পরবর্তী উপন্যাসগুলি হলো 'রাজসিংহ' (১৮৮১), 'আনন্দমঠ' (১৮৮২), 'দেবীচৌধুরানী' (১৮৮৪), 'সীতারাম' (১৮৮৭)।

বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই 'রাজসিংহ'কে 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' বলে আখ্যাত করেছিলেন। উপন্যাসটি উদ্দেশ্যমূলকও বটে। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই বলেছিলেন তিনি আগে কখনও ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখেননি । 'দুর্গেশনন্দিনী' বা 'চন্দ্রশেখর' বা 'সীতারাম'কে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা যেতে পারে না। এই জন্য একেই তিনি প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস বলেছেন। রাজসিংহের মুখ্য পুরুষ চরিত্র 'রাজসিংহ' অবশ্যই ঐতিহাসিক এবং রাজপরিবারভুক্ত ব্যক্তিত্বময় চরিত্র। তবে এই উপন্যাসে মানিকলাল, মবারক প্রভৃতি চরিত্রগুলি সমাজের অন্যান্য অংশের মানুষের পরিচয় বহন করে।

'আনন্দমঠ' অথবা 'দেবীচৌধুরানী' বঙ্কিমের কল্পনাশক্তির চরম প্রকাশরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। উভয় উপন্যাসের মধ্য দিয়েই লেখকের ইংরাজ সরকারের প্রতি গভীর ঘৃণার প্রকাশ ঘটেছে। ইতিহাসের সঙ্গে বাস্তবতার তথা জীবনের ছন্দ মেলাতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র উভয় উপন্যাসকেই তথ্যসমৃদ্ধ করে তুলতে চেয়েছেন। বিশেষত 'দেবী চৌধুরানী' যথেষ্ট ঐতিহাসিক তথ্যসমৃদ্ধ উপন্যাস হওয়া সত্ত্বেও এই দুই উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীদের মধ্যেও বাস্তবতাহীন কল্পনার ছোঁয়া লেগেছে। এর মধ্যে 'দেবী চৌধুরানী' মূলত নায়িকাপ্রধান উপন্যাস। এই উপন্যাসের মুখ্য পুরুষ চরিত্ররূপে যদি ব্রজেশ্বরকে চিহ্নিত করতে হয়, তবে তা একটি ব্যক্তিত্বহীন পুরুষচরিত্র ছাড়া কিছু মনে হয় না। ব্রজেশ্বর জমিদার শ্রেণীর প্রতিনিধি। তবে সম্ভবত ভবানী পাঠককেই এই উপন্যাসের মুখ্য পুরুষ চরিত্র রূপে আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। যাই হোক এই উপন্যাসে বাস্তবতার অভাব এত বেশি, যে কারণে আমাদের আলোচনার প্রতিপাদ্য বিষয় হিসাবে আলোচিত হওয়ার প্রাসঙ্গিকতা হারায়।

'আনন্দমঠ'-এর সত্যানন্দ সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। সত্যানন্দের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র যে গুণগুলির প্রয়োগ ঘটিয়েছেন, তা সেই সময় সত্যই সম্ভব ছিল কিনা সে সম্পর্কে প্রশ্ন জাগে। সর্বোপরি আনন্দমঠের শেষাংশে বঙ্কিম যে কল্পলোকের চিত্র এঁকেছেন তা তাঁর উপন্যাসোচিত বাস্তবতা ও ঔপন্যাসিক আদর্শকে অতিক্রম করে গেছে একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

'সীতারাম' উপন্যাসটিকেও 'দেবী চৌধুরানী' ও 'আনন্দমঠ'এর সঙ্গে একই পংক্তিতে বসানো চলে। তিনটি উপন্যাসেই ধর্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই উপন্যাসের মুখ্য পুরুষ চরিত্র 'সীতারাম'-এর চরিত্রের ওপর এই

ধর্মতত্ত্বের সমস্যা গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। এমন কি শ্রীর সঙ্গে তাঁর সমস্ত সম্পর্কই যেন হিন্দুত্বের বিধি-বিধানের ওপর নির্ভর করেই দাঁড়িয়ে আছে এরূপ মনে হয়।

আমাদের গবেষণার প্রারম্ভিক পর্বে আমরা বলেছি—বঙ্কিমচন্দ্রের উপরোক্ত উপাখ্যানগুলিকে 'নভেল' অর্থে উপন্যাস বলা চলে না। কারণ 'দুর্গেশনন্দিনী' আমাদের একটি নিটোল কাহিনী উপহার দিলেও, কপালকুণ্ডলা-মৃণালিনীতে রোমান্সনির্ভর অনবদ্য কাহিনীর সঙ্গে পরিচিতি ঘটলেও সেগুলি রোমান্সধর্মী অথবা ঐতিহাসিক রোমান্সনির্ভর রচনা। 'এককথায় বাস্তবতা ও রোমান্সের পার্থক্য নির্দেশিত হতে পারে যুগলক্ষণে, উপন্যাস বাস্তবতার শিল্প, আধুনিককালের পূর্বে যা অকল্পনীয়। রোমান্সের কাহিনী মধ্যযুগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, সেখানে বাস্তবতার নিয়ম মোটেই অপরিহার্য নয়।'[৮] আর্নল্ড কেটলের একটি সহায়ক উক্তি এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে—'The adjective 'realistic' is likely to need more justification. The words 'realism' and 'realistic' are need in a very broad sense, to indicate 'relevant to real life' as apposed to 'romance' and 'romantic', by which are indicated escapeism, wishful thinking unrealism'[৯] সে জন্যই চসার, বৌদ্ধজাতক, মঙ্গলকাব্য, এগুলি উপন্যাস নয়। অপরদিকে উপন্যাসেও তেমনি রোমান্স থাকতে পারে। যেমন 'কপালকুণ্ডলা'র অপূর্ব কাব্যসৌন্দর্য। গ্রীক নাট্যসংহতি মেনে নিয়েও বলতে হয় তা এত বেশি রোমান্টিকতা দোষে দুষ্ট যে তা উপন্যাস হিসাবে অকিঞ্চিৎকর। 'রোমান্স যদি হয় সামন্ততন্ত্রের যুগের সাহিত্য, উপন্যাস তবে বুর্জোয়া যুগের সাহিত্য, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সঙ্গে সঙ্গে উপন্যাসের উদ্ভব।...সমাজ কাঠামোর এই পরিবর্তন অর্থাৎ আর্থিক সামাজিক বুনিয়াদের এই আমূল পরিবর্তনকে রবীন্দ্রনাথ 'কালান্তর' বলেছেন।'[১০] 'বঙ্কিমচন্দ্রের আলোচিত উপন্যাসগুলির মধ্যে তাই আলোড়ন সৃষ্টিকারী একাধিক চরিত্রের সমহয় ঘটলেও কল্পনা ও রোমান্টিকতার জটাজালে আবদ্ধ থাকার ফলে তার মুক্তি ঘটেনি। রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়নই সঠিক—'বিষবৃক্ষেই (১৮৭২) প্রথম কাহিনী এসে পৌঁছাল আখ্যানে'। কিন্তু আমাদের আলোচনা করে দেখতে হবে এই যে আমরা নগেন্দ্রনাথকে বাংলা উপন্যাসের প্রথম সার্থক সামাজিক নায়ক হিসাবে পেলাম তা কি একেবারেই আকস্মিক ঘটনা?

'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসে জগৎসিংহ, ওসমান অথবা কতলু খাঁ কিংবা বীরেন্দ্রসিংহ রাজপরিবারের প্রতিনিধি হতে পারে, কিন্তু অভিরাম স্বামীর মধ্য দিয়ে আমরা যে চরিত্র পাই তা কার্যত সন্ন্যাসের চরিত্র হলেও প্রকৃতপক্ষে এক মধ্যবিত্ত গৃহীর চরিত্র। একইভাবে উল্লেখ করা যায় 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের চন্দ্রশেখর চরিত্রটির কথা। এই উপন্যাসের মীরকাশিম ঐতিহাসিক চরিত্র, কিন্তু চন্দ্রশেখর একজন বিদগ্ধ পণ্ডিত ব্যক্তি এবং গৃহী সন্ন্যাসী। মানিকলাল, জীবানন্দ, ভবানন্দ, সত্যানন্দ, দেবী চৌধুরাণীর ব্রজেশ্বর ইত্যাদি চরিত্রগুলির পারস্পরিক আলোচনা আমাদের একথাই কি ভাবতে বাধ্য করে না যে ঐতিহাসিক ও রোমান্টিক বঙ্কিম ধীরে ধীরে প্রস্তুত হচ্ছিলেন বাস্তবতার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নায়ক তৈরি করতে? পূর্বালোচিত উপন্যাসগুলির মধ্যে প্রায় সকলেই বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনায় সৃষ্ট। কখনো সত্য ও তত্ত্ব, কখনো বা তত্ত্ব ও সত্য মিলে এই সকল চরিত্র সৃষ্টি হয়েছে। এদের সাথে সমকালীনতার যোগ বড়ো একটা নেই। কিন্তু চিরকালীন জীবনসত্যের অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক রয়েছে। নবকুমারের দ্বন্দ্বক্ষত ভালোবাসা, পশুপতির অপরিসীম লোভ, মবারকের নিষ্কাম প্রেম বা চন্দ্রশেখরের জীবন যন্ত্রণার স্বরূপ মানবজীবনরহস্যকেই দ্যোতিত করে, যে সত্য চিরকালের; তাকেই উদঘাটিত করে। তাই এই সকল উপন্যাসের চরিত্র নয়, আলোচ্য গবেষণার জন্য প্রয়োজন সেই সকল চরিত্রের যারা মাটির অনেক কাছাকাছি, বলা যায়

সেকালের দেশ কাল সমাজ থেকে যারা উদ্ভূত, তাদের আমরা খুঁজে পাই নগেন্দ্রনাথ ও দেবেন্দ্র (বিষবৃক্ষ), গোবিন্দলাল ও হরলাল (কৃষ্ণকান্তের উইল) 'উ'বাবু ও 'র'বাবু (ইন্দিরা) অমরনাথ ও শচীন্দ্র (রজনী) প্রভৃতির মধ্যে। কিন্তু এই চরিত্রগুলিকে আমরা পেতাম না, যদি বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর ঐতিহাসিক ও রোমান্টিক রচনাসম্ভারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতেন। পূর্বে আলোচিত উপন্যাসগুলির মধ্যে অল্প কয়েকটি হলেও কিছু চরিত্রের মধ্য দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র যে তাঁর সৃষ্টিকলাকৌশলের উত্তরণ ঘটাতে চলেছিলেন তা আমাদের কাছে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। তাই ইতিহাস ও রোমান্টিকতার নির্মোক খসিয়ে নগেন্দ্রনাথ এলেন সাহিত্যজগতের নতুন 'নায়কে'র পরিচয় নিয়ে, 'যে আছে মাটির কাছাকাছি'।

'বিষবৃক্ষ', 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'ইন্দিরা' এবং 'রজনী'র মুখ্য পুরুষ চরিত্রগুলির একটি বৈশিষ্ট্য প্রায় সকলের ক্ষেত্রেই লক্ষণীয় যে এই সকল চরিত্রের অধিকাংশ জমিদার শ্রেণীর, যাদের অন্নবস্ত্রের জন্য চিন্তা করতে হয় না। জীবনকে সুখে অতিবাহিত করার পক্ষে যাদের পুরুষানুক্রমিক প্রাচুর্য প্রচুর। এরাই জীবনকে উপভোগ করতে গিয়ে কখনো জীবনের হলাহলকে পান করতে বাধ্য হয়েছে। কখনো বা অমৃতলাভে ধন্য হয়েছে। নগেন্দ্র বা দেবেন্দ্র বা গোবিন্দলাল কি অমরনাথ জীবনের কঠোর সত্যকে উপলব্ধি করেছে। অবশ্য এই সকল চরিত্রের জীবনচিত্রণের পশ্চাতে লেখকের উপলব্ধিকৃত সত্যও লুকিয়ে রয়েছে। 'ঘরে ঘরে বিষবৃক্ষ আর ফলিবে না', 'পরজন্ম বলিয়া যদি কিছু থাকে···' এ সকল নীতি ও বিশ্বাসকে সামনে রেখেই তাঁর চরিত্র সৃজন। তবে এর মধ্যে ধর্ম, বিবেকের তাড়না, ভালোবাসার প্রকাশ ইত্যাদি দেখিয়ে অনেকটাই প্রত্যাশা পরিপূরক চিত্র করে তুলেছেন। 'ইন্দিরা' উপন্যাসের 'র' বাবু ও 'উ' বাবু এই একই ধরনের প্রত্যাশা পরিপূরক চরিত্র। তবে এই চরিত্রগুলি সেকালের বাঙালি সমাজের বিভিন্ন শহুরে মধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্ত শ্রেণীর বৃত্তিকে তুলে ধরেছে।

আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি, যে কোনো সাহিত্যই সমকালীন যুগের প্রভাবে প্রভাবান্বিত। বঙ্কিম সাহিত্য সম্পর্কেও একথা প্রযোজ্য।

ভারতে ইংরাজ আগমনের ফলে যে নতুন নরনারী দেখা দিল, তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক নানা জটিলতায় সমৃদ্ধ। এরাই বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসাবলীর প্রধান চরিত্র।

'লেনিনের সূত্রের অনুসরণ করে বলা যায় বঙ্কিম রচিত সাহিত্য হইতেই বাঙলা দেশের নানাশ্রেণী সমন্বিত সামাজিক সংস্থানের শিল্পকুশল প্রতিচ্ছবি এবং এই সংস্থানের দুই সীমা হইতেছে একদিকে সিপাহী বিদ্রোহ ও অন্যদিকে স্বদেশী আন্দোলন।' [১১]

বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্দেশ্য ছিল সামন্তবাদের সঙ্গে ধনবাদের সংঘর্ষে দেশের সামাজিক ক্ষেত্রে এবং তার প্রভাবে সামাজিক মানসে যে নতুন চেতনার সঞ্চার হচ্ছে তাকে উপন্যাসের মধ্য দিয়ে রূপায়িত করা। ধনবাদী সমাজের প্রধান লক্ষণ হিসাবে চিহ্নিত করা যায় সমাজ কাঠামোর সেই প্রতিঘাতকে যার ফলে শুরু হচ্ছে ব্যক্তিত্বের বিকাশ এবং ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সংঘাত। 'ধনবাদী সাহিত্য তাই প্রধানত ব্যক্তিমানসের বিস্তারের চিত্রণ ও বিশ্লেষণ।' [১২]

যেহেতু ধনবাদী সমাজের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ দ্রুত পরিবর্তনশীল তাই তার সাংস্কৃতিক উপরিতলেরও ঘনঘন পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। এই কারণেই বাংলাদেশের পাঠকসমাজ একদিন সবিস্ময়ে লক্ষ করল, যে লেখক এতদিন সুদূর ইতিহাসের গণ্ডিতে আপন রচনাসম্ভারকে সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন তিনি এবার তাঁর রচনার মোড় ফেরালেন এক সম্পূর্ণ অভিনব পথে—সমসাময়িক সামন্তবাদী অভিজাত পারিবারিক জীবনের গতিপথে। যে নবচেতনা বঙ্কিম সাহিত্যজগতে নিয়ে এলেন, তাই নতুন যুগের বাস্তবতা। একে উহ্য রেখে কাহিনী রচনা করলে তা

বাস্তবধর্মী হয় না। সমাজ মানসের এই নবচেতনা তখনও পর্যন্ত সাহিত্য জগতে উহ্য ছিল, তাকেই প্রবল অনুভূতি দিয়ে হৃদয়ঙ্গম করে, প্রখর কল্পনা দিয়ে প্রাণবন্ত করে সুদক্ষ আঙ্গিক কুশলতা দিয়ে লোকপ্রিয় করে বঙ্কিম রচনা করলেন 'বিষবৃক্ষ'।

আমরা এখন যে চারিটি উপন্যাস সম্পর্কে আলোচনা করব, সেগুলি হলো, 'বিষবৃক্ষ', 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'ইন্দিরা' ও 'রজনী' কালের পটপরিবর্তনের সাথে সাথে উপন্যাসের মুখ্য চরিত্রেরও সামাজিক অবস্থান বদলেছে, ঐতিহাসিক ও রোমান্টিক 'নায়ক' পরিবর্তিত হয়েছে ভূস্বামী, অভিজাত, মানসিক দ্বন্দ্বে জর্জরিত 'নায়কে'।

'বিষবৃক্ষে'র মুখ্য পুরুষ চরিত্র নগেন্দ্রনাথ যে খ্যাতমান ভূস্বামী তা সহজেই বোঝা যায় লেখক সপ্তম পরিচ্ছেদে নগেন্দ্রনাথের গোবিন্দপুরের ছয় মহলা প্রাসাদের যে বর্ণনা দিয়েছেন তার মধ্য দিয়ে। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে সে সময় 'কুলীন যুগ' শেষ পর্যায়ে। নগেন্দ্রনাথও এক পত্নীত্বে অনুরাগী। এবং সে অনুরাগ এতদূর গাঢ় যে যেহেতু স্ত্রী সূর্যমুখী ঝড়ের সময় নৌকায় না থাকিবার জন্য 'মাথার দিব্য' দিয়েছে, তাই নগেন্দ্রনাথ ঝড়ের সময় নৌকাবতরণ করেছেন। কিন্তু ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ ও মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্ব সার্থক সামাজিক উপন্যাসের মূল উপজীব্য, তাই শুধু সূর্যমুখীতে আসক্ত থাকলে সেই উপজীব্যতা ক্ষুণ্ণ হয়। সুতরাং সেই প্রয়োজন মেটাবার জন্য প্রয়োজন হলো 'কুন্দনন্দিনী'র। এখানে বঙ্কিমচন্দ্র কিছুটা দ্বিধায় পড়েছেন। সে সময়টা প্রগতিশীলতার নিরিখে এতদূর অগ্রসর ছিল না যে লেখক তারাচরণের স্ত্রীর সঙ্গে নগেন্দ্রনাথের পরকীয়া প্রেমের উপস্থাপনা করবেন। তাই কুন্দকে বৈধব্য গ্রহণ করতে হয়েছে। পূর্বেই একথা বলা হয়েছে। নগেন্দ্রনাথ এমন এক সময়ের নায়ক যখন আর্থিক কারণে প্রতিদিনের জীবন ধারণের গ্লানি তাকে অনুভব করতে হয় না। নগেন্দ্রনাথের অধিকৃত জমিদারীর মধ্যে এমনকিছু জটিলতার সন্ধান আমরা পাই না যা নিয়ে নগেন্দ্রনাথকে ব্যস্ত থাকতে হয়। তাই যে মানসিক সমস্যা বঙ্কিম এখানে আনয়ন করলেন তা রূপজ মোহের সমস্যা। সেই মোহের শুরু তারাচরণের মৃত্যুর পর। লেখক বলেছেন, 'এত দূরে আখ্যায়িকা আরম্ভ হইল। এতদূরে বিষবৃক্ষের বীজ বপন হইল।' [১৩]

যে নগেন্দ্রনাথ সাধ্বী, সুন্দরী স্ত্রী সূর্যমুখীতে সম্পূর্ণ সুখী ছিলেন, সেই নগেন্দ্রনাথের মানসিক পরিবর্তনের চিত্র বঙ্কিমচন্দ্র অতি সহজ ও সুন্দর ভঙ্গিতে এঁকেছেন সূর্যমুখীরই জবানীতে—'যদি কুন্দনন্দিনী অন্য স্ত্রীলোকের মতো তাঁহার চক্ষে সামান্যা হইত, তবে তিনি কেন তাহার প্রতি না চাহিবার জন্য ব্যস্ত হইবেন? তাহার নাম মুখে না আনিবার জন্য কেন এত যত্নশীল হইবেন? কুন্দনন্দিনীর জন্য তিনি আপনার নিকট আপনি অপরাধী হইয়াছেন। এ জন্য কখন কখন তাঁহার প্রতি অকারণ ভর্ৎসনা করেন। সে রাগ তাহার উপর নহে—আপনার উপর।···কখন কখন অন্যমনে তাঁহার চক্ষু এদিক ওদিক চাহে, কাহার সন্ধানে, তাহা কি আমি বুঝিতে পারি না? দেখিলে আবার ব্যস্ত হইয়া চক্ষু ফিরাইয়া লয়েন কেন, তাহা কি বুঝিতে পারি না?···আমি যদি রাগ করিয়া বলি 'আমি শীঘ্র মরি' তিনি না শুনিয়া বলেন 'হুঁ'। এত অন্যমনা কেন? একদিন পাড়ার প্রাচীনার দল কুন্দের কথা কহিতেছিল, তাহার বাল্য-বৈধব্য, এই সকল লইয়া তাহার জন্য দুঃখ করিতেছিল। তোমার সহোদর সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আমি অন্তরাল হইতে দেখিলাম, তাহার চক্ষু জলে পুরিয়া গেল—তিনি সহসা দ্রুতবেগে সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন। এখন একজন নূতন দাসী রাখিয়াছি—তাহার নাম কুমুদ। বাবু তাহাকে কুমুদ বলিয়া ডাকেন। কখন কখন কুমুদ বলিয়া ডাকিতে কুন্দ বলিয়া ফেলেন। আর কত অপ্রতিভ হন। অপ্রতিভ কেন?' [১৪]

কুন্দের প্রতি নগেন্দ্রনাথের এই যে মানসিক দৌর্বল্যের প্রকাশভঙ্গিমা তা আধুনিক শিল্পশৈলীরই পরিচায়ক।

এই অংশে নগেন্দ্রনাথ যে রূপজ মোহের প্রলোভনকে প্রাণপণে জয় করার চেষ্টা করছেন, তা আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না। কিন্তু পরবর্তী পরিচ্ছেদগুলিতে এই প্রচেষ্টা যে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে তা আমরা তিনটি ঘটনার মধ্য দিয়ে লক্ষ করি। এই তিনটি ঘটনা হলো, (১) ঔষধ খাওয়াতে গেলে সূর্যমুখীর প্রতি নগেন্দ্রনাথের অহেতুক রাগের প্রকাশ, (২) নগেন্দ্রনাথের মদ্যপান, (৩) নায়েব গোমস্তা কর্তৃক প্রজাদের উৎপীড়ণের সংবাদে নগেন্দ্রনাথের উদাসীনতা। বঙ্কিমচন্দ্র আত্মসংযমে অক্ষম নগেন্দ্রনাথের প্রলোভনকে উপন্যাসের পরিণতির দিকে টেনে নিয়ে গেছেন, কিন্তু তার জন্য উপন্যাসকে তথ্যভারাক্রান্ত করে তুলতে হয়নি। রূপজ মোহে নগেন্দ্রনাথ এতদূর মোহাবিষ্ট যে সূর্যমুখীর অন্তর্বেদনা তার মনে রেখাপাত করেনি। তাই নির্দ্বিধায় সূর্যমুখীকে বলতে পারে, 'আমি এ সংসার ত্যাগ করিব। মরিব না—কিন্তু দেশান্তরে যাইব। বাড়ি ঘর সংসারে আর সুখ নাই। তোমাতে আমার আর সুখ নাই—আমি তোমার অযোগ্য স্বামী···কুন্দনন্দিনীকে সন্ধান করিয়া আমি দেশদেশান্তরে ফিরিব। মনে মনে ভাবিও, তুমি বিধবা—যাহার স্বামী এরূপ পামর সে বিধবা নয় তো কি?'[১৫] নগেন্দ্রনাথ নিজেই স্বীকার করেছেন—'আমি পাপাত্মা—আমার চিত্ত বশ হইল না।'[১৬] নগেন্দ্রনাথের এই বশ না হওয়া চিত্তই উপন্যাসকে চরম পরিণতির দিকে টেনে নিয়ে গেছে। নগেন্দ্রনাথ এই উপন্যাসের মুখ্য পুরুষ চরিত্র কারণ এই চরিত্রের বৈকল্যই সূর্যমুখীকে দেশান্তরী করেছে। কুন্দনন্দিনীর অকালমৃত্যু ডেকে এনেছে। সূর্যমুখীর প্রতি নগেন্দ্রের প্রেম যদি অবিচল থাকতো, তাহলে যেমন সূর্যমুখীকে দেশান্তরী হতে হতো না, কুন্দনন্দিনীর প্রতি নগেন্দ্রের প্রেম যদি অচঞ্চল থাকতো তবে কুন্দনন্দিনীকেও মৃত্যুবরণ করতে হতো না। কিন্তু নগেন্দ্রের মানসিক দোদুল্যমানতা এই দুই নারীকেই জটিল আবর্তের মধ্যে টেনে এনেছে। কিন্তু প্রশ্ন এই নগেন্দ্রনাথ যে যুগের নায়ক, সে যুগে এ ছাড়া আর কি-ই বা সম্ভব ছিল? অর্থের প্রাচুর্য, ভারহীন জীবনযাপনের শিথিলতা, আকাঙ্ক্ষার ধনকে সহজভাবে পাওয়া প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য সে যুগের নায়ক নগেন্দ্রনাথকে জটিল জীবনযাপনে অভ্যস্ত করে তোলেনি। তাই কুন্দকে সহজলভ্য বস্তুর মতোই সে গ্রহণ করেছে। কিন্তু সূর্যমুখীর অন্তর্ধান নগেন্দ্রের চেতনায় আঘাত হেনেছে আর সেই মুহূর্তে কুন্দনন্দিনী হয়েছে অনাদৃতা। এর ব্যতিক্রম ঘটলে কি উপন্যাস চরম পরিণতির দিকে এগোতে পারতো? মৃত্যুকালে কুন্দ নগেন্দ্রনাথকে বলেছে 'কাল যদি একবার আমার নিকটে এমনি করিয়া বলিতে—তবে আমি মরিতাম না।'[১৭] কিন্তু 'কাল' যদি সত্যিই নগেন্দ্র কুন্দর কাছে ফিরে আসতেন, কুন্দকে স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে আপন করে নিতেন, তবে তো 'বিষবৃক্ষ' ফলে-ফুলে পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে পারতো না।

'বিষবৃক্ষে'র আলোচনা প্রসঙ্গে যদি এ কথা বলা হয়ে থাকে যে এই উপন্যাসটি শুধুমাত্র বিধবাবিবাহ সম্পর্কিত একটি সামাজিক আন্দোলনকে উপলক্ষ করে রচিত হয়েছে এবং একটি নির্দিষ্ট নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়েই শুধুমাত্র লেখা হয়েছে তবে ঔপন্যাসিকের প্রতি অবিচার করা হবে। বঙ্কিমের নীতিবাদী মন যে কথাই বলুক না কেন, তাঁর শিল্পীমন ছিল আলাদা। 'বিষবৃক্ষ' তৎকালীন যুগে সামন্তবাদী সমাজে ধনবাদী চেতনা পারিবারিক জীবনে কোনো জটিলতা সৃষ্টি করেছিল তারই ইঙ্গিত বহন করে। সামন্তবাদী সমাজে এমন কিছু বাধা-নিষেধ ছিল, যা নরনারীর পারস্পরিক সম্পর্কের পথে অনেক ক্ষেত্রে বাঁধার সৃষ্টি করতো। তাই আমরা দেখি নগেন্দ্রনাথ একজন সৌভাগ্যবান ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও সংসারের যা কিছু দুর্লভ তা তার করতলগত হওয়া সত্ত্বেও বিষবৃক্ষের বীজ তার দ্বারাই রোপিত হয়েছে। কুন্দনন্দিনীর বৈধব্য এসেছে গল্পের প্রয়োজনে। বিবাহিত নগেন্দ্রনাথের অন্য নারীর প্রতি আসক্তিই মূল কথা। কিন্তু সে যুগে অবিবাহিতা বয়স্কা নারী ভদ্রসমাজে ছিল দুর্লভ। তাই কুন্দকে

বিধবা করা ছাড়া উপায় ছিল না। কুন্দের এই বৈধব্য এবং পরবর্তীকালে নগেন্দ্রনাথকে বিবাহ বিধবা বিবাহের সমর্থন বা খণ্ডনের জন্য নয়। মূল ঘটনার সঙ্গে এই ঘটনা যুক্ত না হলে উপন্যাসের বাস্তবতা নষ্ট হতো। বঙ্কিমের প্রদর্শিত পথেই পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র তাঁদের উপন্যাসে বিধবা নায়িকাদের এনেছেন, কুন্দের আগমন নগেন্দ্রনাথ-সূর্যমুখীর পরিবারে যে জটিলতার সৃষ্টি করেছে তার সহজ সমাধান তৎকালীন সমাজে সম্ভব ছিল না। তাই শেষদৃশ্যে কুন্দকে অঙ্ক মেলাবার জন্য প্রাণত্যাগ করতে হয়েছে। 'যখন বহুবিবাহ নিন্দিত ও বিবাহবিচ্ছেদ কল্পনাতীত, তখন বিষবৃক্ষের অন্য কোনো পরিণাম হইত বাস্তবতা বর্জিত।'[১৮] নগেন্দ্রনাথ এই বাস্তবতা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের মর্যাদা রক্ষা করেছেন বলেই 'বিষবৃক্ষে'র মুখ্য পুরুষ চরিত্ররূপে প্রতিভাত হয়েছেন।

'বিষবৃক্ষে'র পর বঙ্কিমচন্দ্রের যে উপন্যাসটি নিয়ে আলোচনা করব সেটি 'কৃষ্ণকান্তের উইল', যদিও 'রজনী' ও 'ইন্দিরা' এর আগে লেখা হয়েছে। তবু 'বিষবৃক্ষে'র সাথে 'কৃষ্ণকান্তের উইল' সম্পর্কে আলোচনা না করলে সে সময়ের সমাজপ্রেক্ষিতে ভূস্বামী নায়কদের চরিত্রবৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে। দুটি উপন্যাসই সার্থক পারিবারিক উপন্যাস। দুটি উপন্যাসের মধ্য দিয়েই বিবাহিত পুরুষের অন্য নারীতে আসক্তির কথা উল্লিখিত হয়েছে। উপলক্ষরূপে আনা হয়েছে বিধবাবিবাহের সমস্যা। উভয় উপন্যাসের নায়কই ভূস্বামী—জমিদার। এই উপন্যাসের মুখ্য পুরুষ চরিত্র গোবিন্দলাল। 'বিষবৃক্ষ' অপেক্ষাও 'কৃষ্ণকান্তের উইল' অনেক বেশি মনস্তত্ত্বমূলক। উপন্যাসটির মধ্যে গোবিন্দলাল নগেন্দ্রনাথের মতোই পত্নীপ্রেমে বিভোর। কিন্তু রোহিনীর প্রতি তাঁর মোহ এই প্রেমের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। ব্যক্তিত্বময়ী ভ্রমর এই ব্যভিচার মেনে নিতে পারেনি। মোহভঙ্গ হওয়ার পর রোহিনীর মৃত্যু ঘটেছে। কিন্তু গোবিন্দলালের আত্মঅহমিকা ভ্রমরের কাছে তাকে ফিরে যেতে দেয়নি। পরিণামে সে না পেয়েছে রোহিনীকে, না ভ্রমরকে। ভ্রমরের মৃত্যু সমগ্র উপন্যাসটিকে এক করুণ পরিসমাপ্তির দিকে নিয়ে গেছে। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন—আধুনিক উপন্যাসের সমগ্র ধারা যদি আলোচনা করা যায়, তবে দেখা যাবে সেখানে নারীরই প্রাধান্য বেশি। তার কারণ ধনবাদী সমাজে নারী তার ব্যক্তিত্ববিকাশের সুযোগ খুঁজে পেয়েছে। এই সমাজের উৎপাদন পদ্ধতি নারীর স্বাধীনতার মূল ভিত্তি। একথা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও স্বীকার করেছেন—'বঙ্গসাহিত্যে পুরুষ মহাদেবের ন্যায় নিশ্চলভাবে ধূলিশয়ান এবং রমণী তাহার বক্ষের উপর জাগ্রত জীবন্তভাবে বিরাজমান···আমাদের সাহিত্যে স্ত্রীলোক যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, তাহার প্রধান কারণ—আমাদের দেশের স্ত্রীলোক আমাদের দেশের পুরুষের অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ।'[১৯] অর্থাৎ বাংলা সাহিত্যে প্রধান গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রগুলি সবই নারী চরিত্র। কিন্তু আমাদের আলোচ্য বিষয় যেহেতু মুখ্য পুরুষ চরিত্র তাই যে কয়টি গুরুত্বপূর্ণ পুরুষ চরিত্র আমরা পাই সেগুলির আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতেই আমাদের স্থির করতে হবে এদের সামাজিক অবস্থান। এর আগে নগেন্দ্রনাথের আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখেছি নগেন্দ্রনাথ ধনী জমিদার। এ ছাড়া আরও একটি চরিত্র দেবেন্দ্রও জমিদার। কিন্তু এই উপন্যাসেই একটি ক্ষুদ্র চরিত্র শ্রীশচন্দ্র কিন্তু বেনিয়ান-মুৎসুদ্দীর পূর্বপুরুষ। এই ধরনের কয়েকটি ছোটোখাটো চরিত্র ছাড়া বেশিরভাগ চরিত্রই ভূস্বামী চরিত্র।

প্রশ্ন উঠতে পারে গোবিন্দলালকে মুখ্য পুরুষ চরিত্র বলছি কেন? হরলাল যদি রোহিনীকে দলিল চুরি করতে না বলতো তবে তো ঘটনা এতদুর গড়াতো না।' কিন্তু গোবিন্দলালের চরিত্রে যে অন্তর্দ্বন্দ্ব উপস্থিত হরলাল চরিত্রে তা নেই। গোবিন্দলাল রোহিনীর রূপজ মোহে আবিষ্ট হয়েছে সত্য, কিন্তু ভ্রমরকে অন্তর থেকে বিসর্জন দিতে পারেনি। লেখক বলছেন—'গোবিন্দলাল দুইজন স্ত্রীলোককে ভালো বাসিয়াছিলেন—ভ্রমরকে আর রোহিনীকে। রোহিনী

মরিল—ভ্রমর মরিল। রোহিনীর রূপে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন—যৌবনের অতৃপ্ত রূপতৃষ্ণা শান্ত করিতে পারেন নাই—ভ্রমরকে ত্যাগ করিয়া রোহিনীকে গ্রহণ করিলেন। রোহিনীকে গ্রহণ করিয়াই জানিয়াছিলেন যে, এ রোহিনী, ভ্রমর নহে এ রূপতৃষ্ণা, এ স্নেহ নহে—এ ভোগ, এ মুখ নহে—এ মন্দার ঘর্ষণপীড়িত কামুকি নিঃশ্বাস নির্গত হলাহল, এ ধন্বন্তরি তাও নিঃসৃত সুধা নহে। বুঝিতে পারিলেন যে, এ হৃদয়সাগর মন্থন করিয়া যে হলাহল তুলিয়াছি, তাহা অপরিহার্য, অবশ্য পান করিতে হইবে—নীলকণ্ঠের ন্যায় গোবিন্দলাল যে বিষ পান করিলেন। নীলকণ্ঠের কণ্ঠস্থ বিষের মতো সে বিষ তাঁহার কণ্ঠে লাগিয়া রহিল। সে বিষ জীর্ণ হইবার নহে—সে বিষ উদগীর্ণ করিবার নহে, কিন্তু তখন সেই পূর্বপরিজ্ঞাত স্বাদ বিশুদ্ধ ভ্রমর প্রণয়সুধা স্বর্গীয় গন্ধযুক্ত, চিত্তপুষ্টিকর, সর্ব্বরোগের ঔষধস্বরূপ, দিবারাত্রি স্মৃতিপথে জাগিতে লাগিল। যখন প্রসাদপুরে গোবিন্দলাল রোহিনীর সঙ্গীতস্রোতে ভাসমান, তখনও ভ্রমর তাঁহার চিত্তে প্রবলপ্রতাপযুক্তা অধীশ্বরী—ভ্রমর অন্তরে, রোহিনী বাহিরে। তাই রোহিনী অত শীঘ্র মরিল। যদি কেহ সে কথা না বুঝিয়া থাকেন, তবে বৃথাই আখ্যায়িকা লিখিলাম।'[২০]

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য এখানেও বঙ্কিমচন্দ্র রোহিনী নামক বাল্যবিধবাকে এনেছেন। এই বাল্যবিধবার প্রতি অনুরাগ অথবা রূপজ মোহের আকর্ষণ গোবিন্দলালকে এক দুর্নিবার পরিণতির দিকে নিয়ে গেছে। সেই সঙ্গে উপন্যাসের গতিপথও চালিত হয়েছে এক নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে। এ প্রসঙ্গে একটি কথা উল্লেখযোগ্য। এই উপন্যাসের নায়িকা ভ্রমর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে সূর্যমুখী অথবা কুন্দ অপেক্ষা অনেক বেশি উজ্জ্বল। একথা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে বঙ্কিমচন্দ্র যে সময়ের লেখক সে সময় নগেন্দ্রনাথ অথবা গোবিন্দলালের মতো যুবক নায়কদের পক্ষে বয়স্ক অথচ অবিবাহিতা নায়িকা পাওয়া অসম্ভব ছিল বলেই কুন্দ অথবা রোহিনীর সৃষ্টি। আবার কুন্দ অথবা রোহিনীকে বাদ দিয়ে নায়কের মানসিক দ্বন্দ্ব, মানসিক যন্ত্রণাকে পরিস্ফুট করাও সম্ভব নয়। এই যুগকে বলা যায় 'পরিবৃত্তিকালিক'। শিক্ষিত বাঙালি একই সঙ্গে ব্যক্তি হয়ে উঠতে চাইছে আবার ঔপনিবেশিক বদ্ধতায় আবদ্ধ হচ্ছে। বঙ্কিম একই সঙ্গে ব্রিটিশ শাসনের সুফলের অংশীদার আবার তার সমালোচক। ইউরোপীয় সভ্যতা, ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি ও বাঙালি মধ্যবিত্ত বাস্তব এই তিনটিকেই মেলাতে চেয়েছিলেন।

সূর্যমুখী, কুন্দনন্দিনী, রোহিনী, ভ্রমর এরা যেমন তুলনীয়, তেমনি নগেন্দ্রনাথ ও গোবিন্দলালও তুলনীয়। গোবিন্দলাল নগেন্দ্রনাথ অপেক্ষা অনেক বেশি জীবন্ত ও বাস্তব। নগেন্দ্রনাথ অপেক্ষা গোবিন্দলাল বেশি নিষ্ঠুর ও অমানবিক বলেই বোধহয় তার অন্তর্দ্বন্দ্ব নগেন্দ্রনাথ অপেক্ষা অধিক। তাই তার প্রায়শ্চিত্ত ও পরিণতিও কঠোর ও করুণ। কিন্তু এই পরিণতির মধ্যেও গোবিন্দলালের আত্মস্বাতন্ত্র্যবোধ উল্লেখযোগ্য। চরম আর্থিক দুরবস্থার মধ্যেও গোবিন্দলাল একথায় বিস্মৃত হননি যে কৃষ্ণকান্ত রায় সম্পত্তি লিখে দিয়ে গেছেন ভ্রমরকে, গোবিন্দলালকে নয়। তিনি বলেছেন, 'আমার জ্যেষ্ঠতাত মিথ্যাবাদী ছিলেন না। বিষয় তোমার, আমার নহে। তিনি যখন তোমাকে লিখিয়া দিয়া গিয়াছেন, তখন বিষয় তোমার, আমার নহে।'[২১] তিনি ভ্রমরের কাছে অন্নভিক্ষা করেছেন, কিন্তু ভ্রমর তাঁকে সম্পত্তি লিখে দিলেও তিনি সে সম্পত্তি গ্রহণ করতে রাজী হননি। গোবিন্দলাল যদি তাঁর চরম দুর্ভাগ্যের দিনে ভ্রমরের কাছে আত্মসমর্পণ করতেন বিনাদ্বিধায় তার কাছে অপরাধ স্বীকার করে সম্পত্তি ভোগ করার মধ্য দিয়ে সুখে দিনযাপন করতেন তাহলে উপন্যাসের 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' হতো সন্দেহ নেই, কিন্তু সেক্ষেত্রে উপন্যাসের শিল্পরস ক্ষুণ্ণ হতো। যে নায়ককে আমরা সার্থক উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দুরূপে অথবা মুখ্য ভূমিকায় দেখতে চাই তা আমরা পেতাম না। নগেন্দ্রনাথ ও গোবিন্দলাল এই দুটি চরিত্রের যদি তুলনামূলক আলোচনা করা যায়, তবে

আমরা দেখবো গোবিন্দলাল নগেন্দ্রনাথ অপেক্ষা বেশি ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, চারিত্রিক দৃঢ়তাসম্পন্ন পুরুষ।

'নগেন্দ্রনাথ হিন্দুর অতীত ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, গোবিন্দলাল পাশ্চাত্যরুচিসম্পন্ন যুবক।' উভয়ের রুচির পার্থক্য বোঝা যায় নগেন্দ্রনাথের শয়নগৃহের অঙ্কিত ছবি ও গোবিন্দলালের বাগানের মর্মর মূর্তির তুলনা করলে। নগেন্দ্রনাথ গোবিন্দলালের মতো কোনোদিন কুন্দকে অবৈধ মিলনের প্রস্তাব দেননি। দিলেও হয়ত কুন্দ সম্মত হতো না। নগেন্দ্রনাথের মনে ছিল সামাজিক অনুশাসনের ভয়। কিন্তু যখন তিনি জানলেন বিধবা বিবাহ শাস্ত্রসম্মত তখন সে ভয় দূর হলো। কিন্তু নগেন্দ্রনাথ প্রথমাবধিই কুন্দকে বিবাহ করারই পক্ষে ছিলেন। গোবিন্দলালের মতো কোনোদিনই তিনি অবৈধভাবে বসবাস করতে চাননি। নগেন্দ্রনাথের মতো গোবিন্দলালেরও সুখের কোনো অভাব ছিল না। 'বিষবৃক্ষে' নগেন্দ্রনাথ ও সূর্যমুখীর সুখী দাম্পত্যজীবনের অনেক চিত্র লেখক অঙ্কিত করেছেন। 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ সে সুযোগ কম। কিন্তু রোহিনীর চৌর্য্যবৃত্তির সংবাদ অন্দরমহলে পৌঁছবার আগে যে সুখী দাম্পত্য মিলনের চিত্র অতি অল্প কথায় বঙ্কিমচন্দ্র এঁকেছেন তা এককথায় অনবদ্য। কিন্তু উভয়ের দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্যে একটি তফাত অনায়াসেই চোখে পড়ে। নগেন্দ্রনাথের কাছে সূর্যমুখী সখী, ভার্যা নগেন্দ্রনাথ যেন সূর্যমুখীর ওপর অনেক বেশি নির্ভরশীল। তাই 'মাথার দিব্য' দেওয়ায় নগেন্দ্রনাথ ঝড়ের সময় নৌকার ভিতর থাকতে নারাজ, তাই কুন্দকে পাবার পর তাকে নিয়ে কি করবেন তার পরামর্শ চান সূর্যমুখীর কাছে। কিন্তু গোবিন্দলাল ভ্রমরের ওপর এরূপ নির্ভরশীল নন। গোবিন্দলালের পিতৃব্য জমিদারী শাসন করেন, ভ্রমরের সঙ্গে রহস্যালাপে ও কৃত্রিম কলহে তাঁর দিন কাটে কিন্তু রোহিনীকে জিজ্ঞাসাবাদের দায়িত্ব গোবিন্দলাল ভ্রমরকে দেননি। নগেন্দ্রনাথ কুন্দকে যখন গ্রহণ করেছিলেন, সহজ প্রবৃত্তিবশেই করেছিলেন। কিন্তু গোবিন্দলাল রোহিনীর কাছে স্থায়ীভাবে ফিরে গেছেন রূপমোহে আচ্ছন্ন হবার সঙ্গে সঙ্গে ; কিছুটা ভ্রমরের প্রতি অভিমান, কিছুটা সম্পত্তি না পাওয়ায় আত্মঅহংকারে ঘা লেগে আহত হয়ে। নগেন্দ্রনাথের অর্থ, রূপ, সাধ্বী স্ত্রী এই সবকিছুর সঙ্গে ছিল সূর্যমুখীর অতুলনীয় স্নিগ্ধ রূপমাধুর্য। গোবিন্দলালের সব কিছুর সাথে একটি জিনিসের অভাব ছিল তা হলো ভ্রমরের রূপ। যতদিন রোহিনীর আগুনের মতো রূপ গোবিন্দলালকে দগ্ধ করেনি ততদিন ভ্রমরের এই কালো রূপের আলো গোবিন্দলালকে মুগ্ধ করে রেখেছিল, কিন্তু রোহিনীর প্রেমে আকৃষ্ট হয়ে গোবিন্দলালেরও মনে হয়েছে, 'এ কালো! রোহিনী কত সুন্দরী! এর গুণ আছে, তাহার রূপ আছে। এতকাল গুণের সেবা করিয়াছি, এখন কিছুদিন রূপের সেবা করিব।' [২২]

'ইন্দিরা' সম্পূর্ণ রোমান্টিক পরিবেশে সমাজ জীবনের চিত্র। উপন্যাসটি নায়িকা প্রধান। এই উপন্যাসে বঙ্কিম নিজেকে অন্তরালে রেখে নায়িকার মুখে তার সুখ-দুঃখ পূর্ণ বিচিত্র কাহিনী বর্ণনা করেছেন। 'ইন্দিরার জগৎ সম্পূর্ণ নারীর জগৎ'। —এই কারণে এই উপন্যাসে কোনো পুরুষচরিত্র সম্পূর্ণ বিকাশ লাভ করতে পারেনি। এর মধ্যে যে পুরুষ চরিত্রগুলি আমরা পাই সেগুলি হলো ইন্দিরার আশ্রয়দাতা দরিদ্র ব্রাহ্মণ, কৃষ্ণদাসবাবু, রামরামবাবু, রমণবাবু এবং অবশ্যই এই উপন্যাসের নায়ক তথা মুখ্য পুরুষ চরিত্র উপেন্দ্রবাবু। কিন্তু উপেন্দ্রবাবুকে বাদ দিলে আর সমস্ত চরিত্রগুলিকে আমরা ততটুকুই পাই যতটুকু তাঁরা ইন্দিরার সংস্পর্শে এসেছেন। এমনকি নায়ক উপেন্দ্রবাবুও যে এই উপন্যাসে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছেন এমন কথা বলা চলে না। উপেন্দ্র'র পারিবারিক আয়ের উৎস সম্পর্কে কোনো উল্লেখ আলোচ্য উপন্যাসে নেই। তবে ইন্দিরার পিতার চিঠির মধ্য দিয়ে আমরা জানতে পারি বিবাহের সময় উপেন্দ্র কোনো উপার্জন করত না। 'আমার পিতা ধনী, শ্বশুর আমাকে লইতে লোক পাঠাইয়াছিলেন কিন্তু পিতা পাঠাইলেন না ;—বলিলেন, বিহাইকে বলিও যে, আগে আমার জামাতা উপার্জন করিতে শিখুক—

তারপর বধূ লইয়া যাইবেন—এখন আমার মেয়ে লইয়া গিয়া কি খাওয়াইবেন?'[২৩] এই কথা শুনে উপেন্দ্র প্রতিজ্ঞা করলেন যে স্বয়ং অর্থোপার্জন করে পরিবার প্রতিপালন করবেন। এই ভেবে তিনি পশ্চিমাঞ্চলে যাত্রা করলেন। পরবর্তীকালে আমরা জানতে পারি যে উপেন্দ্র 'কামসেরিয়েটে' কাজ করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। এতক্ষণ আমরা 'বিষবৃক্ষ' অথবা 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র মধ্য দিয়ে ভূস্বামীপ্রধান চরিত্রই পেয়েছি। এই প্রথম আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের এমন একজন নায়ককে পেলাম যিনি শুধুমাত্র অপরের পরিশ্রমের অর্থে জীবিকার্জন করছেন না। নিজ পরিশ্রমলব্ধ অর্থ উপার্জনের জন্য বিদেশে গমন করছেন। বঙ্কিমসাহিত্যে এই ব্যতিক্রম অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। উপেন্দ্রবাবু নারীর রূপমুগ্ধ এক যুবক কিন্তু তথাকথিত আধুনিক। ইন্দিরার ভাষায়— তিনি বুদ্ধিমান কর্মঠ লোক। নহিলে এত অল্পদিনে এত টাকা রোজগার করিতে পারিতেন না।···কিন্তু রমণবাবুর মতো এখনকার ছেলের মতো, 'উচ্চশিক্ষায়' শিক্ষিত নহেন। তিনি ঠাকুর দেবতা মানিতেন। নানা দেশে ভ্রমণ করিয়া, ভূত, প্রেত, ডাকিনী, যোগিনী, যোগী, মায়াবিনী প্রভৃতির গল্প শুনিয়াছিলেন। সে সকল একটু বিশ্বাস করিতেন। তিনি আমার দ্বারা যেরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন, তাহাও তাঁহার এই সময়ে স্মরণ হইল ; যাহাকে আমার অসাধারণ বুদ্ধি বলিতেন, তাহাও স্মরণ হইল।···অতএব আমি যে বলিলাম, 'আমি মানুষী নহি, তাহাতে তাঁহার একটু বিশ্বাস হইল।[২৪] অবশ্য একথা ঠিক উপেন্দ্রবাবু ইন্দিরার একথা বিনা যুক্তিতে বিশ্বাস করেননি। যুক্তি দিয়ে বুঝতে চেয়েছেন। এবং ইন্দিরাকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জেরা করতে শুরু করেছেন। অবশেষে এমন মতও পোষণ করেছেন যে কুমুদিনী হয়তো বা তাঁর হারিয়ে যাওয়া স্ত্রী ইন্দিরা। উপেন্দ্র যদি একথা মনেপ্রাণে বিশ্বাস না করতেন তাহলে রমনবাবুকে প্রশ্ন করতেন না, 'কুমুদিনী কি ইন্দিরা, আপনার স্ত্রীকে ভালো করিয়া জিজ্ঞাসা করিবেন।'[২৫] মহেশপুরে পৌঁছে তিনি কামিনীর কাছে প্রশ্ন করেছেন ইন্দিরা এসেছে কিনা।

উপেন্দ্রবাবু রূপপিপাসু। এর আগে 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল' আলোচনাকালে নগেন্দ্রনাথ ও গোবিন্দলালের চরিত্রেও এই বৈশিষ্ট্য আমরা দেখেছি। এই অর্থে নগেন্দ্রনাথ ও গোবিন্দলালের সঙ্গে উপেন্দ্র তুলনীয়। রূপজ মোহে আকৃষ্ট হয়ে নগেন্দ্রনাথ কুন্দকে বিয়ে করলেন, গোবিন্দলাল রোহিনীকে নিয়ে দেশান্তরী হলেন। এই একই মোহে আকৃষ্ট হয়ে উপেন্দ্রবাবু পাঠিকারূপিনী ইন্দিরাকে নিজ বাসভবনে নিয়ে গেলেন। কিন্তু যে উপেন্দ্র কুমুদিনী বনাম ইন্দিরার সামান্য কটাক্ষেই বিভ্রান্ত হয়ে যান ; সেই ইন্দিরাকে কাছে পেয়েও উপেন্দ্র দৈহিক সম্বন্ধে দূরত্ব বজায় রাখেন ইন্দিরার অনুরোধে যা আমাদের কিছুটা অস্বাভাবিক ঠেকে'। এবং এই অর্থে উপেন্দ্রকে আমরা যখন মুখ্য পুরুষ চরিত্ররূপে চিহ্নিত করি তখন আধুনিক উপন্যাসের নায়ক চরিত্রের বাস্তবতা কিছুটা ক্ষুণ্ণ হয়। প্রকৃতপক্ষে 'ইন্দিরা' উপন্যাসে রোমান্সের আধিক্যই বেশি'। এবং উপেন্দ্র ছাড়া অন্য কোনো গুরুত্বপূর্ণ পুরুষ চরিত্র এই উপন্যাসে অনুপস্থিত বলেই উপেন্দ্রকে আমাদের উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দুরূপে গ্রহণ করতে হয়েছে। আসল কথা 'ইন্দিরা'ই সমগ্র উপন্যাসটির গতিপথকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। উপেন্দ্রের চরিত্রের যে দোদুল্যমানতা তা কেবল কুমুদিনীকে কেন্দ্র করে। উপেন্দ্র কুমুদিনীর প্রকৃত পরিচয় জানার জন্য আগ্রহী হয়েছে নিজের স্ত্রীর জন্য কুমুদিনীকে হারাবার ভয়ে। তবে একথাও ঠিক ইন্দিরার সঙ্গে উপেন্দ্রের মিলন যদি সহজ পথে হতো তবে উপন্যাসের চমক ও নতুনত্ব দুই-ই ক্ষুণ্ণ হতো। তাছাড়া যে পরিবেশে লেখক ইন্দিরা ও উপেন্দ্রের প্রথম সাক্ষাৎ ঘটিয়েছেন উপন্যাসের পটভূমিকায় সেটাই বাস্তবসম্মত হয়েছে। যে স্ত্রী সঙ্গে ভালোভাবে পরিচয় পর্যন্ত ঘটেনি, যে স্ত্রীর দস্যুহস্তে অপহৃতা হওয়ার পরও দীর্ঘদিন পর্যন্ত কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। সেই স্ত্রীর স্মৃতিকে আঁকড়ে থেকে অসাধারণ রূপলাবণ্যবতী

নারীর আহ্বানকে উপেক্ষা করাই হতো অবাস্তবতা। এই অর্থে উপেন্দ্রের ভূমিকা আলোচ্য উপন্যাসে উল্লেখযোগ্য সন্দেহ নেই। রোমান্সধর্মী সমাজজীবনের উপন্যাসে 'ইন্দিরা'তে মুখ্য পুরুষ চরিত্র উপেন্দ্রের এই অবদানটুকু স্বীকার করে আমরা প্রসঙ্গান্তরে যাবো।

আমরা সর্বশেষ যে উপন্যাসটি নিয়ে আলোচনা করবো তা হলো 'রজনী'। 'রজনী', 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র আগে লিখিত হলেও উপন্যাসটির বিষয়বস্তু অনেক বেশি জটিল। 'রজনী' উপন্যাসে আমরা যে পুরুষ চরিত্রগুলি পাই, তার মধ্যে দুইটি প্রধান, শচীন্দ্র ও অমরনাথ। এর মধ্যে কোন চরিত্রটিকে আমরা মুখ্য পুরুষ চরিত্রের সম্মানে ভূষিত করবো? সারা উপন্যাসটির অনেক বেশি অংশ জুড়ে আছে শচীন্দ্র। কিন্তু তা সত্ত্বেও অমরনাথ চরিত্রটিই সম্ভবত এই গৌরবের অধিকারী হওয়ার যোগ্য কেন, সে আলোচনায় আসার আগে দেখা যাক এই উপন্যাসে কোন আর্থ— সামাজিক অবস্থায় এরা দাঁড়িয়ে আছেন। অমরনাথের পিতার ভূসম্পত্তির সূত্র কি তা সঠিকভাবে উপন্যাসে উল্লেখ না থাকলেও অমরনাথ বলেছেন, 'আমার পিতার ভূসম্পত্তি যাহা ছিল—তদ্দ্বারা অন্য উপায় অবলম্বন না করিয়াও সংসারযাত্রা নির্বাহ করা যায়। লোকে তাঁহাকে ধনী বলিয়া গণ্য করিত।'[২৬] শচীন্দ্রের পিতা রামসদয় মিত্র পিতার সঙ্গে বিবাদ করে প্রথমা স্ত্রীকে নিয়ে কলকাতায় এলেন। সেই স্ত্রীর কিছু পিতৃদত্ত অর্থ এবং একজন সজ্জন বণিকের সাহায্যে রামসদয় বাণিজ্য করতে শুরু করলেন। এখানে আমরা ধরেই নিচ্ছি অমরনাথের পিতা যে অর্থ উপার্জন করেছিলেন তা জমিজমা সংক্রান্ত উপায়েই করেছিলেন। কিন্তু শচীন্দ্রের যে পৈতৃক সম্পত্তি তা ব্যবসাবাণিজ্য সূত্রে প্রাপ্ত। অর্থাৎ এখানে বঙ্কিমচন্দ্রের নায়কের অর্থনৈতিক দিক থেকে এক নতুন রূপ দেখতে পাচ্ছি যা পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের অনেক চরিত্রের মধ্যেই দেখেছি।

শচীন্দ্র ও অমরনাথের মধ্যে কোন চরিত্রটিকে এবং কেন মুখ্য পুরুষ চরিত্রের ভূমিকায় বসানো যায় তা আলোচনা করা যাক। শচীন্দ্র ও অমরনাথ এই দুইজনের চরিত্র আলোচনা করলে দেখা যায় শচীন্দ্র 'রজনী' উপন্যাসের অনেকখানি অংশজুড়ে থাকলেও অমরনাথের জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত অনেক বেশি। শচীন্দ্রের জীবনে কোনো জটিলতা ছিল না। এমনকি তার প্রেমের মধ্যেও কোনো জটিলতা নেই। সে রজনীকে বিবাহ করতে আগ্রহী ছিল না।' এবং কেন ছিল না তা সে অকপটেই স্বীকার করেছে। 'রজনী সুন্দরী হইলেও অন্ধ, রজনী পুষ্পবিক্রেতার কন্যা এবং রজনী অশিক্ষিতা। রজনীকে আমি বিবাহ করিতে পারি না; ইচ্ছাও নাই। আমার বিবাহে অনিচ্ছাও নাই। তবে মনোমত কন্যা পাই না। আমি যাহাকে বিবাহ করিব, সে রজনীর মতো সুন্দরী হইবে, অথচ বিদ্যুৎকটাক্ষবর্ষিণী হইবে; বংশমর্যাদায় শাহ আলমের বা মহলাররাও হুঙ্কারের প্র-পরাপ সৎ পৌত্রী হইবে, বিদ্যার লীলাবতী বা শাপভ্রষ্টা সরস্বতী হইবে এবং পতিভক্তিতে সাবিত্রী হইবে; চরিত্রে লক্ষ্মী, রন্ধনে দ্রৌপদী, আদরে সত্যভামা এবং গৃহকর্মে গদার মা। আমি পান খাইবার সময় পানের লবঙ্গ খুলিয়া দিবে, তামাকু খাইবার সময় হুকায় কলিকা আছে কিনা বলিয়া দিবে, আহারের সময় মাছের কাঁটা বাছিয়া দিবে এবং স্নানের পর গা মুছিয়াছি কি না, তদারক করিবে। আমি চা খাইবার সময় দোয়াতের ভিতরে চামচে পুরিয়া চায়ের অনুসন্ধান না করি এবং কালির অনুসন্ধানে চায়ের পাত্রমধ্যে কলম না দিই ; তদ্বিষয়ে সতর্ক থাকিবে ; পিক্‌দানীতে টাকা রাখিয়া বাক্সের ভিতর ছেপ না ফেলি, তাহার খবরদারী করিবে। বন্ধুকে পত্র লিখিয়া আপনার নামে শিরোনামা দিলে, সংশোধন করাইয়া লইবে, পয়সা দিতে টাকা দিতেছি কি না, খবর লইবে। নোটের পিঠে দোকানের চিঠি কাটিতেছি কিনা দেখিবে এবং তামাসা করিবার সময়ে বিয়ানের নামের পরিবর্তে ভক্তিমতী প্রতিবাসিনীর নাম করিলে ভুল সংশোধন করিয়া লইবে। ঔষধ খাইতে

ফুলেল তৈল না খাই, চাকরানীর নাম করিয়া ডাকিতে হেটসের সাহেবের মেমের নাম না ধরি এ সকল বিষয়ে সর্বদা সতর্ক থাকিবে। এমন কন্যা পাই তবে বিবাহ করি।' [২৭]

এমন সহজ সরল যার জীবনদর্শন বিশেষত একজন উচ্চশিক্ষিত যুবক হিসাবে যে পরিচিত তাকে নায়ক তথা মুখ্য পুরুষ চরিত্ররূপে গণ্য করা যায় কিনা ভাবা দরকার।

উপন্যাসের মধ্য অংশে আমরা দেখি, শচীন্দ্রের রজনীর প্রতি অনুরাগ জন্মেছে এবং বিবাহ করতে সম্মত হয়েছে। কিন্তু এ অনুরাগ স্বাভাবিক পথে আসেনি। 'সন্ন্যাসীর অলৌকিক শক্তির সাহায্যে শচীন্দ্রনাথ জানিতে পারিয়াছে যে রজনী তাহার প্রতি আসক্ত এবং তাঁহার ততোধিক অলৌকিক শক্তিতে শচীন্দ্রনাথ রজনীতে আসক্ত হইয়াছে'[২৮] তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের সামান্য কিছু পরিচয় পাওয়া যায় যখন সে টাকার জন্য রজনীকে বিবাহ করতে অস্বীকার করে।

অপরদিকে ভাগ্যবিড়ম্বিত নায়ক অমরনাথ জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতে জর্জরিত। তরুণ বয়সে লবঙ্গলতা কর্তৃক অপমানের জ্বালা সে বিস্মৃত হয়নি। কিন্তু লবঙ্গের প্রতি দুর্বার প্রেম তাকে লবঙ্গকে ভুলতে দেয়নি। পরবর্তীকালে রজনীকে সে বিবাহ করতে চেয়েছে। কিন্তু যখন সে উপলব্ধি করতে পেরেছে রজনী ও শচীন্দ্র পরস্পরকে ভালোবাসে তখন সে নীরবে মরে গেছে। মনে মনে বলেছে, 'রজনী শচীন্দ্রের, শচীন্দ্র রজনীর, মাঝখানে আমি কে?'[২৯] অমরনাথের এই মনোভাব রজনীর প্রতি ঔদাসীন্য নয়, নিজের গভীর মর্মবেদনা। রজনীকে বিবাহ করার ইচ্ছা শচীন্দ্রের মতো স্বপ্নলব্ধ নয়, কিংবা দয়াপরবশ নয়। অমরনাথের কথায়—'রমণীকূলে অন্ধ রজনী অদ্বিতীয় রত্ন। লবঙ্গলতার প্রোজ্জ্বল জ্যোতিও তাহার কাছে ম্লান হইল। আমি ইতিপূর্বেই রজনীর অন্ধনয়নে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলাম—আজি তাহার কাছে বিনামূল্যে বিক্রিত হইলাম। এই অমূল্য রত্নে আমার অন্ধকার পুরী প্রভাসিত করিয়া এ জীবন সুখে কাটাইব।' [৩০] অমরনাথ রজনী হৃতসম্পদ উদ্ধার করেছিল। কিন্তু তার জন্য সে কোনোদিন রজনীকে দাবি করেনি। সম্পত্তির লোভেও সে রজনীকে বিবাহ করতে চায়নি। লবঙ্গলতা যখন সম্পত্তির কথা বলেছে তখন তার উত্তর—'আমি রজনীকে বিবাহ করিব—বিষয় বিবাহ করিব না।'[৩১]

অমরনাথ সর্বাপেক্ষা আমাদের দৃষ্টি ও শ্রদ্ধা অর্জন করে সেই দৃশ্যে যখন লবঙ্গলতা অমরনাথকে ভয় দেখিয়ে বলে যে সে যদি রজনীকে বিবাহ করা থেকে নিরস্ত না হয় তা হলে লবঙ্গ-রজনীর কাছে অতীতের সেই কলঙ্কজনক কাহিনী বলে দেবে যা অমরনাথের কাছে চরম লজ্জার ও অপমানের। লবঙ্গলতা আশা করেছিল অমরনাথ এ কথায় ভয় পাবে এবং বিবাহ থেকে নিরস্ত হবে। কিন্তু অমরনাথ যখন বলে, 'শুনাইতে হয় শুনাইও, তুমি শুনাও বা না শুনাও, আমি স্বয়ং আজি সকল শুনাইব। আমার যোগ্য দোষগুণ সকল শুনিয়া রজনী আমাকে গ্রহণ করিতে হয় গ্রহণ করিবে, না করিতে হয় না করিবে। আমি তাহাকে প্রবঞ্চনা করিব না।'[৩২] তখন লবঙ্গলতার গর্বিত মাথা নত হয়ে যায়। কিন্তু শেষ দৃশ্যে আমরা দেখি অমরনাথ রজনীকে বিবাহ করা থেকে নিরস্ত হয়েছে, কিন্তু তার এই নিরস্ত হওয়া কাপুরুষতা নয় প্রেমের কাছে আত্মবলিদান। তাই কঠোরে, কোমলে, প্রেমে, ঔদার্যে, মহানুভবতায় অমরনাথ আমাদের কাছে একটি অত্যন্ত বাস্তব চরিত্র—যা আত্মস্বাতন্ত্র্যবোধে উজ্জ্বল। মানসিক দ্বন্দ্বে দীন এক গুরুত্বপূর্ণ পুরুষ চরিত্র। এই কারণেই অমরনাথ আমার মতে এই উপন্যাসের নায়ক তথা মুখ্য পুরুষ চরিত্র।

'রজনী' সম্পর্কে আর একটি বিষয় আলোচনা করা প্রয়োজন মনে করি। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলি আলোচনাকালে আমরা দেখেছি আধুনিক উপন্যাস রচনার উপযোগী কলাকৌশল এই উপন্যাসগুলির মধ্যে বহুল

পরিমানে বর্তমান। বঙ্কিমের আধুনিক শিল্পমন তাঁর অনেক রচনাকেই যথেষ্ট সমৃদ্ধ করেছে। কিন্তু বেশ কিছু রচনার মধ্যে আবার বঙ্কিমের নীতিবাদী মনও উঁকি দিয়েছে। তাই 'বিষবৃক্ষ' বঙ্কিম কামনা করেছেন এই ফল যেন আর কারও ঘরে না ফলে। 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' নায়ক গোবিন্দলালকে তিনি নিয়ে গেলেন সন্ন্যাসের পথে' অর্থাৎ বিধবা অথবা বিবাহিতা নারীর অবৈধ প্রণয়কে বঙ্কিম ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখেননি। কিন্তু সেই বঙ্কিমকে আমরা রজনীতে এক নতুনভাবে আবিষ্কার করলাম। পঞ্চম খণ্ডের তৃতীয় পরিচ্ছেদের একটি অংশ এখানে উল্লেখ করতে চাই। এই দৃশ্যে লবঙ্গলতা অমরনাথকে জিজ্ঞাসা করছে, 'তুমি আমার সঙ্গে সাক্ষাতের ইচ্ছা করিয়াছ কেন? তুমি নাকি কলিকাতা হইতে উঠিয়া যাইতেছ?

আমি—যাইব

লবঙ্গ—কেন?

আমি—যাইব না কেন? আমাকে যাইতে বারণ করিবার তো কেহ নাই।

লবঙ্গ—যদি আমি বারণ করি?

আমি—আমি তোমার কে যে বারণ করিবে?

লবঙ্গ—তুমি আমার কে? তা ত জানি না। এ পৃথিবীতে তুমি আমার কেহ নও। কিন্তু যদি লোকান্তর থাকে।'[৩৩]

যে বঙ্কিমচন্দ্র 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে চন্দ্রশেখরের সঙ্গে শৈবলিনীর সম্পর্ককে জন্ম জন্মান্তরের সম্পর্ক বলে উল্লেখ করেছেন, অর্থাৎ যে বিবাহিতা নারীর স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক শুধু এক জনমের নয় তা জন্মান্তরের অচ্ছেদ্য বন্ধন সেই বঙ্কিমচন্দ্রই লবঙ্গের মুখ দিয়ে বলালেন ইহলোকে তার সঙ্গে অমরনাথের সম্পর্ক যাই হোক না কেন জন্মান্তরে তার সঙ্গে অমরনাথের সম্পর্ক এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। এই দুঃসাহসিকতা ও চিন্তার আধুনিকতা অনবদ্য যা বঙ্কিমভাবনার এক নতুন দিককে উন্মোচিত করেছে বলে মনে হয়েছে।

বঙ্কিম উপন্যাসে মুখ্য পুরুষ চরিত্রের আলোচনা শেষ করার আগে আমাদের মনে রাখতে হবে যে উপন্যাস মানুষেরই কথা বলে। সে যুগকে তীক্ষ্ণভাবে বিশ্লেষণ করে অনুভবের মধ্য দিয়ে সমকালীন সমাজ পরিবেশের চিত্র ফুটিয়ে তোলে। সাহিত্যক্ষেত্রে বাংলা উপন্যাসের জনক বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁর কিছু ব্যতিক্রম নন। তাঁর সাহিত্যেও সমকালীন সমাজ জীবনের ছবিই আমরা দেখেছি। তবে তিনি মূলত বাংলা দেশের অভিজাত বা জমিদার সমাজের কথাই বলেছেন। 'বিষবৃক্ষ', 'ইন্দিরা', 'রজনী' 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'দুর্গেশনন্দিনী', 'কপালকুণ্ডলা', 'চন্দ্রশেখর', 'দেবী চৌধুরানী'—সমস্ত উপন্যাসের মধ্য দিয়েই হিন্দু জমিদার সমাজ বা মুসলমান অভিজাত সমাজ প্রধান স্থান অধিকার করে আছে। স্বাভাবিকভাবেই বঙ্কিমের অধিকাংশ সাহিত্যের নায়ক-নায়িকারা তাই এই জমিদারেরই প্রতিনিধি। অন্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে যারা নায়ক বা নায়িকার স্থান অধিকার করেছে, তারাও জমিদার বা ধনীদের আশ্রিত। তাই বঙ্কিম উপন্যাস অভিজাত বা উচ্চবিত্তের উপন্যাস, সাধারণ বা নিম্নবিত্তের উপন্যাস নয় এবং এই উচ্চবিত্ত সমাজের কথা বলেছেন বলেই বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলিকেও এই সমাজের করেই রচনা করেছেন। বঙ্কিম উপন্যাসের যে সব সমস্যা যেমন সম্পত্তির হস্তান্তর সমস্যা, বিধবা বিবাহ সমস্যা, বহুবিবাহ এগুলি অভিজাত বা বিত্তশালী সমাজেরই সমস্যা একথা অবশ্যই বলা যেতে পারে। আমরা 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসে দেখি বিধবা বিবাহ কৃষ্ণকান্তের কাছে এরূপ গুরুতর সমস্যা হিসাবে দেখা দিয়েছে যে তিনি পুত্রকে ত্যাগ করতে পর্যন্ত দ্বিধাবোধ করেননি। কিন্তু সাধারণ অন্ত্যজ সমাজ বা নিম্নবিত্ত সমাজের কাছে এ সমস্যা তত তীব্র ছিল না। যেহেতু

মধ্যবিত্ত সমাজের অর্থচিন্তা তখন এত প্রবল ছিল না, তাই বহুবিবাহ তখন সমাজের সর্বস্তরেই প্রচলিত ছিল।

'নগেন্দ্রনাথ গোবিন্দলালের সমাজ নিচুতলার সমাজ নয়, তা হলে এই সব সমস্যার সমাধান এমন আবেগ দ্বারা পরিচালিত হত না— অর্থাৎ সূর্যমুখীর গৃহত্যাগ, কুন্দের আত্মহত্যা, ভ্রমরের মৃত্যু, রোহিনীকে হত্যা—এসব কিছুরই প্রয়োজন হত না। অন্ত্যজ সমাজের মানুষ নিজেদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা নিয়ে এত ব্যস্ত যে, তাদের মূল জীবনবোধ এত সূক্ষ্ম অনুভূতির দ্বারা পরিচালিত হত না। আমাদের মনে রাখতে হবে বঙ্কিমচন্দ্র যে সমাজের চিত্র এঁকেছেন তা অভিজাত বা উচ্চবিত্ত সমাজ। কাজেই সে সমাজ কুন্দের বিষপান বা গোবিন্দলালের পিস্তলের গুলির দ্বারা পরিচালিত হয়ে আপনার আভিজাত্য অবশ্যই বজায় রাখবে।'[৩৪]

'Art can not be separated from social force in origin, in effect and in its very nature.'[৩৫]

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের এই ধরনের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল জটিল চরিত্রের আভাস আমরা পাই সামাজিক পটপরিবর্তনের মধ্য দিয়ে তারই পরিণত প্রকাশ আমরা পাব রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে।